প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান- প্রযুক্তি

2nd Sem. History Hons.

Paper -3, Unit - 4

: প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের ইতিহাস প্রসঙ্গে প্রায়শই দুটো কথা শোনা যায়। একদিকে একদল মানুষ প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের ব্যাপারে অসম্ভব কাল্পনিক অবিশ্বাস্য নানারকম দাবি উত্থাপন করতে থাকেন: বৈদিক বিমান, প্লাস্টিক সার্জারি, আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, বিবর্তন তত্ত্ব, কোয়ান্টাম বিদ্যা, ইত্যাদি। আর অন্যদিকে, তার যুক্তি ও তথ্যভিত্তিক সমালোচনা শুনে আর এক দল লোকের মনে হয়, যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক ও মার্ক্সবাদীদের মধ্যে প্রাচীন ভারতের প্রতি কোনওরকম শ্রদ্ধাবোধ নেই। তারা জানতেও চায় না, প্রাচীন কালে এই দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কোন কোন ক্ষেত্রে কতটা বিকাশ হয়েছিল এবং কীভাবে। সব কিছুই তারা আজগুবি কল্পনা বলে উড়িয়ে দেয়। অথচ, তাদের কি অন্তত একবার দেখে নেওয়া উচিত না, কী কী আবিষ্কার এদেশে হয়েছিল? সেগুলিকে আধুনিক জ্ঞানের তালিকাভুক্ত করে নেওয়াও উচিত।

সঙ্ঘ-বৃত্তের দাবিগুলির ভিত্তিহীনতা এবং অযৌক্তিকতা নিয়ে আমি কিছু দিন আগে অনীক পত্রিকার ২০১৫ সালের “মৌলবাদ এখন” শীর্ষক শারদ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে সবিস্তার লিখেছিলাম। [মুখোপাধ্যায় ২০১৫খ] সেই লেখাটি একাধিক জায়গায় পরে নানা আকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। তাই এখানে সেই সব বিষয়ের পুনরুল্লেখের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় বিষয়টিই, অর্থাৎ, সত্যি সত্যিই আমাদের দেশে কী কী জানা গিয়েছিল, এখানে আলোচনা করতে চাইব।

প্রাচীন ভারতের প্রাচীনত্ব

প্রাচীন ভারত বলতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোন সময়কালকে বোঝায়, সেটাও আমাদের বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। কেন না, এখানেও একটা বিরাট বিভ্রান্তি অনেক দিন

ধরে বাসা বেঁধে রয়েছে। ভারতে আধুনিক কায়দায় গুছিয়ে ইতিহাসের পাঠ লেখা শুরু হয় ইংরেজ আমল ও শাসনের হাত ধরে। তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থেই ইংরেজ শাসকরা ভারত ইতিহাসের যে পাঠ রচনা করেছিল, তাতে যুগ বিভাজন করেছিল এইভাবে: হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ ও ব্রিটিশ যুগ। তাদের লক্ষ্য ছিল, স্কুল স্তরে ভারতীয় ছাত্রদের প্রাক ব্রিটিশ সময়কালের ইতিহাস পড়ানোর নাম করে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিকাশ ঘটানো। পরবর্তী কালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ইতিহাস লেখকরা যখন থেকে নিজেদের জ্ঞানমতে লিখতে শুরু করলেন, তাঁরা নামগুলো বদলে দিলেন, প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ। কিন্তু সময়ের মাইলফলকগুলি সেই একই থেকে গেল। "হিন্দু যুগ"-টাই হল প্রাচীন যুগ। মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কাল থেকেই শুরু হল এঁদের "মধ্য যুগ"। আর এর ফলে প্রাচীন ভারতের সময় সীমানা চলে এল ১১৯২ সাল অবধি। যখন তরাইনের যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরি পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন দখল করেন।

মজার কথা হল, এই ইতিহাসবিদদের অনেকেই আবার প্রাচীন ভারতের প্রাচীনত্ব যতটা পারেন অতীতের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকেন। সম্ভব অসম্ভব, বাস্তব অবাস্তব, সাক্ষ্য-প্রমাণ — এই সব ভাবনা তাঁদের কখনই তাড়িত বা বিচলিত করে না। অর্থাৎ, যেখানে ইতিহাসের মূল কথাই হল সময়ের নিরিখে মানুষের কার্যকলাপ [Bloch 1984, 27], এঁরা সেই সময়কেই উপেক্ষা করে ইতিহাসের পাঠ নির্মাণ করে চলেন। অনেক সময় এঁদের হাবভাব দেখে সন্দেহ হয়, এঁরা ভারতের গোটা ইতিহাসকেই পারলে বুঝি প্রাচীন ইতিহাস বানিয়ে দেবেন!

যাই হোক, আমরা এই রচনায় আধুনিক পদ্ধতিতে যুগ বিভাজনের রীতি মেনে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল অবধি প্রাচীন যুগ হিসাবে ধরব এবং সেই মতো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করব।

প্রথম পর্ব: হরপ্পা সভ্যতা

অনেকেই জানেন, বর্তমান পাকিস্তানের বালুচিস্তান জেলার বোলান পাসের কাছে মেহেরগড়ে যে নবপলীয় গ্রামীণ কৃষি সংস্কৃতির উন্মেষ হয়েছিল, তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে হরপ্পা তাম্রব্রোঞ্জ সভ্যতার সূত্রপাত। এই কৃষি সংস্কৃতির কালানুক্রমিক বিস্তার আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ৭০০০-২০০০, অর্থাৎ, হরপ্পা সভ্যতার প্রায় অন্তিম কাল পর্যন্ত। মেহেরগড় আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৭৪-৭৫ সালে এক দল ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিকের খননকার্যের মধ্য দিয়ে।

এর ফলে হরপ্পা সভ্যতার বিকাশের পশ্চাদপ্রেক্ষাপটটি খুব সুন্দরভাবে জানা গেছে।

সমস্যা হচ্ছে, হরপ্পা যুগের মানুষদের নিজস্ব কোনও বক্তব্য আজ অবধি আমাদের গোচরে এসে পৌঁছয়নি। তারা নিজেরা সেই সভ্যতাকে কী নামে সম্বোধন করত, তাদের রাজা কেউ ছিল কিনা, থাকলে কে বা কারা, ইত্যাদি, জানার কোনও উপায় আমাদের হাতে এখনও নেই। বিভিন্ন সিল বা মুদ্রার গায়ে লিখিত যে লিপি পুরাতত্ত্ববিদরা উদ্ধার করেছেন, তার সংখ্যা নেহাত কম নয়। কিন্তু তাদের পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয়নি। ফলে একটা বিরাট সময় ধরে যারা এই সভ্যতা নির্মাণ করেছে, রক্ষা ও বিকশিত করেছে, এবং অবশেষে পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছে, সেই জনমণ্ডলী সম্বন্ধে কোনও প্রত্যক্ষ খবর আমাদের কাছে নেই।

তবে, কৃতি সাক্ষ্যও যা আছে তার পরিমাণ এবং গুরুত্ব খুব কম নয়। অবিভক্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রায় দশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে অন্তত আটটি বড় নগর সহ তারা যে প্রায় ১২০০ নগর সংস্কৃতির ক্ষেত্র নির্মাণ করেছিলেন, সেই সব ক্ষেত্র সমীক্ষা করে বিপুল সংখ্যক প্রত্নসাক্ষ্য পাওয়া গেছে। তার থেকে অনেক কিছুই সরাসরি জানা যায়, আরও অনেক কিছু আন্দাজ করা সম্ভব। বিজ্ঞানের জগতে তারা কতখানি তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়েছিল জানা না গেলেও যে প্রযুক্তিবিদ্যা তারা আয়ত্ত করেছিল বলে দেখা গেছে, তাও অত্যন্ত বিস্ময়কর।

হরপ্পা সভ্যতার তিনটে পর্যায়:

খ্রিঃ পূঃ ৩৫০০-৩০০০: উন্মেষ কাল;

খ্রিঃ পূঃ ৩০০০-২৪০০: বিকশিত কাল;

খ্রিঃ পূঃ ২৪০০-১৮০০: অন্তিম কাল।

এই নগর সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট হল অসংখ্য পাকা দালান; সাজানো সুবিন্যস্ত রাস্তাঘাট; রাস্তার বিভিন্ন দূরত্বে জনসাধারণের জন্য নির্মিত স্নানঘর; নগরের ময়লা জল বের করে দেবার জন্য চমৎকার পয়ঃপ্রণালী; কৃষির জন্য সুপরিকল্পিত সেচব্যবস্থা; নগরের নানা জায়গায় ফসল সংরক্ষণের উদ্দেশে নির্মিত শস্যগৃহ; ইত্যাদি। প্রতিটি নগরের চারদিকে ছিল সুরক্ষা প্রাচীর। তারা চাকা উদ্ভাবন করেছিল; পোড়া মাটির শক্ত সুঠাম ঠাসা চাকা বানিয়ে তার উপর তক্তা লাগিয়ে মালপত্র রাখার ব্যবস্থা করত; এইভাবে তারা তৈরি করেছিল সেকালের মালবাহী গাড়ি। তারা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে বিভিন্ন দ্রব্যের পরিমাণ মাপার উপযোগী বাটখারা নির্মাণ করেছিল। এই সমস্ত কাজের পেছনে যে সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কিছু দূর অবধি বিকাশ লাভের একটা ভূমিকা ছিল, তা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

জ্ঞানের এই বিকাশকে লিপিবদ্ধ করে ধরে রাখার প্রয়োজন তারা নিশ্চয়ই অনুভব

করেছিল। সেই সূত্র ধরেই উদ্ভাবন করেছিল লিপি এবং সংখ্যালিপি। এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করা না গেলেও কতগুলি বৈশিষ্ট প্রায় সর্বসম্মতভাবেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। যেমন, এক: এদের লিপিগুলি ঠিক একক ধ্বনিবাচক অক্ষর নয়, বরং অনেকটা ভাববাচক ছবি (pictograph) বা বাক্যাংশের চিত্ররূপ (ideograph)। দুই: এরা খুব সম্ভবত ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লিখত।

খুব স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত হরপ্পা ক্ষেত্র থেকে অসংখ্য পোড়া মাটির নানারকম কাজে ব্যবহার্য বিভিন্ন আকারের পাত্র এবং দেবদেবী পশুপাখি ও মানুষের বহু মূর্তি পাওয়া গেছে। এছাড়া পাথরের পাত্র বা বাসনপত্র এবং ধাতব পাত্রও পাওয়া গেছে অনেক। যা দেখে বোঝা যায়, এদের সময়কালে নানা রকম কুটিরশিল্প গড়ে উঠেছিল। তাম্রব্রোঞ্জভিত্তিক ধাতুশিল্প বহু দূর অবধি বিকশিত হয়েছিল। হরপ্পা নগরগুলিতে সোনা রুপো তামা টিন ও সিসা পাওয়া গেছে। কিন্তু এরা লোহার ব্যবহার জানত না।

এত সমুন্নত ও বিস্তৃত একটি সভ্যতার শেষ পর্যন্ত পতন হল কেন?

একটা দীর্ঘ সময় ধরে মনে করে আসা হয়েছে যে বাইরে থেকে আগত বৈদিক জনজাতিগুলির প্রবল অনুপ্রবেশ ও আক্রমণই এই ধ্বংসের জন্য দায়ী। ১৯৫৩ সালে পুরাতত্ত্ববিদ মর্টিমার হুইলার [Wheeler 1968] এবং তার ভিত্তিতে বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী ইতিহাস রচয়িতা বিজ্ঞানী দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বিও [Kosambi 1975, 72-73] এই তত্ত্বকল্পেই আস্থা রেখেছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, এই পতনের পেছনেও রয়েছে এই সভ্যতার নিজেরই অবদান। বহিরাক্রমণ নয়, সমগ্র হরপ্পা ক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এক বাস্তুতান্ত্রিক বিপর্যয় নেমে আসার ফলেই একটা সময় এই এলাকাগুলি ছেড়ে এর অধিবাসী সমস্ত মানুষ অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। সিন্ধু নদীতন্ত্রের অববাহিকায় প্রায় দুই সহস্রাধিক বছর ধরে গাছপালা বনজঙ্গল কেটে ফেলে নগরায়নের ফলে সুবিশাল অঞ্চল জুড়ে সবুজ ধ্বংসের দীর্ঘমেয়াদি পরিণামে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যেতে থাকে, ধীরে ধীরে ভূপৃষ্ঠের উপরিতলের জমিতে ব্যাপক শুষ্কায়ন ঘটে এবং মরুভূমি বিস্তার লাভ করতে থাকে। চাষবাসের পক্ষে হরপ্পা তার সমস্ত সুবিধা হারিয়ে ফেলে। হয়ত এরই পরিণামে কোনও একটা বছরে অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে দাঁড়ায় যে মানুষজন খুব তাড়াহুড়ো করেই এই সব নগর ছেড়ে পূর্ব ও দক্ষিণে সরে যেতে বাধ্য হয়। এই দিক থেকে হরপ্পা তার উত্তরাধিকারী হিসাবে আমাদের কাছে একটা বড় শিক্ষা রেখে গেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কার্ল মার্ক্সের ১৮৬০-এর দশকে লেখা এক গুচ্ছ নোটে কার্ল ফ্রাস সহ এমন কিছু সমকালীন বিজ্ঞানীর মতামত লিপিবদ্ধ রয়েছে বলে দেখা গেছে, যাঁরা ব্যাবিলনিয়া, পারস্য, মিশর, গ্রিস, প্রভৃতি স্থানের উন্নত কৃষিব্যবস্থার এই একইরকম ধ্বংসাত্মক পরিণতির কথা বলেছেন। সেকালে হরপ্পা সভ্যতার কথা জানা ছিল না।

থাকলে সেই তালিকায় হয়ত এর নামও যুক্ত হত। [Saito 2016]

বৈদিক সংস্কৃতি

খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ নাগাদ যখন হরপ্পা নগর সভ্যতা ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে চলে যায়, তার কয়েকশো বছরের মধ্যেই একই ভূমণ্ডলে পশ্চিম এশিয়ার তুরস্ক পার্শ্ববর্তী আনাতোলিয়া অঞ্চল থেকে আগত মানবগোষ্ঠী, যারা পারস্য ও আফঘানিস্তানে বসবাস করছিল, তাদেরই কিছু কিছু জনজাতির মানব দল সিন্ধুনদীর খরস্রোত উপেক্ষা করে পুব পারে চলে আসে। ইতিহাসে ভুল করে এদের আর্য, ইন্দো-আর্য ইত্যাদি নামে পরিচয় দেওয়া হয়। আমরা এদের পরবর্তী সুকৃতির কথা স্মরণে রেখে এই মানবদলকে বৈদিক জনজাতি হিসাবে উল্লেখ করব। আনুমানিক ১৫০০ খ্রিঃ পূঃ নাগাদ এদের আগমন শুরু হয় এবং মোটামুটি ১০০০ খ্রিঃ পূঃ পর্যন্ত এই পূর্বমুখী অভিবাসন চলতে থাকে। তারপর থেকে ধীরে ধীরে এই জনপ্রবাহ থিতিয়ে আসে এবং গঙ্গা যমুনা অববাহিকায় একটা স্থিতিশীল গোষ্ঠিজীবনের বিকাশ ঘটে।

এই সময় থেকে ভারতে এদের যে জীবনযাপনের পদ্ধতি দেখা যায়, যার ব্যাপ্তি মোটামুটি খ্রিঃ পূঃ ১৫০০-৫০০, তাকে নৃতাত্ত্বিক পরিভাষায় বৈদিক সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। এবং বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের নিরিখে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়:

খ্রিঃ পূঃ ১৫০০-১০০০: উন্মেষ কাল; বৈদিক সাহিত্য, মৌখিক রচনা;

খ্রিঃ পূঃ ১০০০-৫০০: সংস্কৃত ভাষার বিকাশ কাল; পাণিনি — বিশ্বের প্রথম বৈয়াকরণ, ভাষার বৈজ্ঞানিক নির্মাণ; কৃষির সূত্রপাত; ভারত ও রামকথার বীজ বপন; লিপি ও লিখন শুরু;

খ্রিঃ পূঃ ৫০০-০: মহাকাব্য রচনা শুরু।

একে আমরা বৈদিক সভ্যতা না বলে কেন সংস্কৃতি হিসাবে চিহ্নিত করছি, সেটাও এই জায়গায় এসে আমাদের স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া দরকার।

নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের নিরিখে সংস্কৃতি ও সভ্যতার কিছু সুনির্দিষ্ট পার্থক্য আছে। মানুষের অপশুসুলভ জীবনযাপন পদ্ধতিকে (অর্থাৎ, নিছক জৈবিক অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে উঠে বেঁচে থাকার সামাজিক প্রক্রিয়াকে) নৃতত্ত্বের পরিভাষায় সাধারণভাবে সংস্কৃতি বলা হয়ে থাকে। অস্তিত্বের এই যাপনে জীবিকার যে মূল হাতিয়ারটি ব্যবহৃত হয়, বা তার যে উপাদান তাদের সদ্য করায়ত্ত হয়েছে, তার নামেই সেই সংস্কৃতির পরিচয় দেওয়া হয়। অনেক সময় সেই উপাদানের যে নমুনা সাক্ষ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, বা যে স্থানে তা প্রথম পাওয়া গেছে তার নামেও এই সংস্কৃতি পরিচিতি লাভ করে। যেমন: নবপলীয় সংস্কৃতি,

মৃৎপাত্র সংস্কৃতি, চালকোলিথিক সংস্কৃতি কিংবা নিয়ান্ডারথাল সংস্কৃতি, ইত্যাদি।

সভ্যতা হচ্ছে এইরকম একটি বিশেষ মানব সংস্কৃতি, যেখানে প্রথম কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। যথা: নগর জীবন, পাকা দালানবাড়ি, প্রাচীর, পরিখা, লিপি, সংখ্যালিপি, ওজনমাপক, ধাতব হাতিয়ার, মুদ্রা, যানবাহন, ইত্যাদি।

বৈদিক জনজাতিগুলির জীবনযাপন পদ্ধতি বৈদিক সাহিত্যের ভিত্তিতে অনুসরণ করলে দেখা যায়, শুরু থেকে প্রায় প্রাক-বৌদ্ধ কাল পর্যন্ত এদের বৈশিষ্ট্য ছিল শিকার সংগ্রহ ও পশুপালন। এরা ছিল এক যাযাবর সমরপ্রিয় (nomadic martial) গোষ্ঠী। সিন্ধু-গঙ্গা অববাহিকায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এরা যতটুকু বনজঙ্গল পেয়েছিল, তার মধ্যেই ঝুপড়ি বা কুঁড়েঘর বানিয়ে ছোট ছোট দল বেঁধে বাস করত এবং আশপাশ থেকে শিকার ও সংগ্রহ করে খাদ্য সংস্থান করত। অনেক সময় অন্য জনজাতির সংগ্রহে হানা দিয়েও এরা খাদ্যদ্রব্য লুটে আনত।

কিন্তু এরকম একটা অবস্থার মধ্যে থেকেও এরা জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে করতে এক বিপুল মৌখিক সাহিত্যের জন্ম দিয়েছিল, যার তুলনা অনুরূপ অবস্থায় থাকা বিশ্বের আর কোনও যাযাবর শিকার-সংগ্রহকারী জনজাতির মধ্যে দেখা যায় না। অসংগঠিত অবিন্যস্ত ভাষায় হলেও ছন্দবদ্ধ কবিতার ঢঙে রচিত এই সমস্ত ছড়াগুলি তারা মুখে মুখে রচনা করেছে, আবৃত্তি করেছে এবং বংশ পরম্পরায় রক্ষা করে গেছে। কমপক্ষে সাত-আটশো বছর। যতদিন না তারা লিপি ও লিখিত সাহিত্যের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিল। ঋক-বেদ এই অর্থে বিশ্বের এক প্রাচীনতম সাহিত্য এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের এক অনুপম কীর্তি।

আবার যখন, আনুমানিক ৮০০-৫০০ খ্রিঃ পূঃ কালের মধ্যে কোনও এক সময়ে তারা লিপি আবিষ্কার করে লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করল, সেই সময় থেকেই তারা ভাষার প্রতি আরও যত্নবান হয়ে বেদের যুগের মৌখিক ভাষাকে সংস্কার ও সংগঠিত করার দিকে মন দিল। তার ফলে জন্ম নিল “সংস্কৃত” ভাষা। পৃথিবীর একমাত্র ভাষা যা কোনও স্থান বা জাতির নামে পরিচিত হয়নি। ইংলিশ, ফরাসি, স্প্যানিশ, চিনা, জাপানি, গারো, মুন্ডারি, তামিল, তেলুগু, পাঞ্জাবির মতো নয়; এর নামটি এল এক কৃৎ প্রত্যয় হিসাবে — সংস্কার দ্বারা নির্মিত, অর্থাৎ, সংস্কৃত।

আর সে এক বিরাট নির্মাণ! মানুষের কথোপকথনকালে উচ্চারণযোগ্য প্রায় সমস্ত (সব নয় কিন্তু) ধ্বনির জন্য অক্ষর তৈরি হল। ধ্বনিগুলোকে সাজানো হল প্রথমে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ হিসাবে। স্বরধ্বনিগুলোকে বিন্যস্ত করা হল উচ্চারণের ক্রমিকতা অনুযায়ী। অ অ্যা আ ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ . . . ইত্যাদির আকারে। ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকেও প্রথমে এক বর্গাকারে স্থাপন করা হল। উচ্চারণের শারীরস্থান অনুসারে সারি; উচ্চারণের তীব্রতা

অনুসারে স্তম্ভ। প্রতিটি বর্গেই রাখা হল এক একটি নিজস্ব আনুনাসিক ধ্বনি। অঙ্ক চঞ্চল কণ্টক দন্ত আর স্তম্ভ — কেউ নাসিক ধ্বনির জন্য কারও নিজের বর্গের বাইরে থেকে ধার নেবে না। অন্যান্য উচ্চারিত ধ্বনিগুলিকে রাখা হল তারপর। পৃথিবীতে আর কোনও ভাষাই তার মৌল কাঠামোতে এতটা সুবিন্যস্ত ও সুগঠিত নয়। পাণিনির ব্যাকরণ "অষ্টাধ্যায়ী" খ্রিঃ পূঃ ৮০০-৫০০ সময়কালের মধ্যেকার রচনা। কিন্তু গ্রন্থটি গত (অন্যূন) আড়াই হাজার বছর ধরে প্রায় সমান প্রাসঙ্গিক থেকে গেছে। যা প্রাচীন কালের কোনও বই সম্পর্কেই বলা চলে না, বা বলার প্রশ্ন ওঠে না।

অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ ভাগ থেকে ব্রিটিশ ফরাসি জার্মান ওলন্দাজ পণ্ডিতেরা সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে চর্চা করতে করতে এই সব বৈশিষ্ট্য দেখে শুনে একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। ওয়ালটার ইউজিন ক্লার্ক এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন, তার মধ্যে এতটুকুও অত্যুক্তি নেই: "The study of language in India was much more objective and scientific than in Greece or Rome. The interest was in empirical investigation of language rather than in philosophical theories about it. Greek grammar tended to be logical, philosophical and syntactical. Indian study of language was as objective as the dissection of a body by an anatomist." [Clark 1937, 339-40]

তিনি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন: "It would be very strange if this analytical and empirical spirit had been confined entirely to the study of language. There are reasons for believing that it extended into other matters as well." [Clark 1937, 340] সত্যিই তো। চিন্তার বাহন ভাষা নিয়ে যাদের এত মাথাব্যথা, তারা যে জাগতিক আরও পাঁচটা বিষয়ে মাথা ঘামাবে এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ সত্য খুঁজে বের করবে, তাতে কি সন্দেহ করা চলে?

চলে যে না, তার প্রমাণ মিলতে শুরু হল বেদোত্তর বা বৌদ্ধযুগের সময়কাল থেকেই। লিখিত ভাষা আয়ত্ত করার মানে হল কৃষিকর্ম ততদিনে এই ভূখণ্ডে আবার শুরু হয়ে গেছে।

বৌদ্ধযুগে বিজ্ঞান

আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের কোনও এক সময় থেকে বৌদ্ধযুগের শুরু বলে ধরা হয়। ইতিহাস চর্চার স্বার্থে আমাদের জেনে রাখা ভালো, গৌতম বুদ্ধ বা মহাবীর জৈন — এঁদের দুজনের কারওই কোনও ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ব্যক্তি-অস্তিত্ব নির্ণয়

করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু দুজনের প্রায় একইরকম জীবন কাহিনি শুনে বা পড়ে মনে হয়, এরকম কাছাকাছি কোনও (এক বা একাধিক) চরিত্রের হয়ত জন্ম হয়েছিল যিনি (বা যাঁরা) সমকালে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি এবং ধর্মচর্চায় বেশ কিছু রদবদল করেছিলেন।

তার ভিত্তিমূলে ছিল কৃষি সংস্কৃতির পুনরাবির্ভাব। ক্রমে ক্রমে এসে গেল নগর সভ্যতা। মগধ রাজ্যের পত্তন। সমাজে শ্রেণি বিভাজন এবং শ্রেণি শাসন এই প্রথম খুব স্পষ্টভাবে দেখা গেল। তার জাগতিক ফল হয়েছিল বেশ যুগান্তরিক। অচিরেই শিক্ষা ও বিজ্ঞানের বিস্তার ঘটতে দেখা গেল উত্তর ভারতের একাধিক জায়গায়। এই সময়েই গড়ে উঠল তক্ষশীলার বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্র খ্রিঃ পূঃ ৬ষ্ঠ-৪র্থ শতকে। সেখানে দর্শনের পাশাপাশি চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা শুরু হল খুব গুরুত্ব সহকারে। ইতিপূর্বে অথর্ববেদ থেকে আয়ুর্বেদ নামক এক শাস্ত্রের জন্ম হয়েছিল, যার অন্যতম কাজ ছিল মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা এবং কিছু কিছু রোগভোগের ক্ষেত্রে গাছগাছালির শেকরবাকড় রস পাতা ইত্যাদি খেয়ে আরোগ্য লাভের পন্থা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত ও সচেতন করা।

তক্ষশীলা পর্যায়ে বেশ কিছু প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়। আত্রেয়, জীবক, অগ্নিবেশ, চরক এবং শুশ্রুত। এঁদের মধ্যে বেনারস অঞ্চলের শুশ্রুতর নাম শল্যবিদ্যা প্রয়োগের সাথে যুক্ত হয়ে আছে। তাঁর নামে প্রচলিত “শুশ্রুত সংহিতা” নামক যে বইটা আছে তাতে এক জায়গায় তিনি বলেছেন: “No accurate account of any part of the body, including even its skin, can be rendered without a knowledge of anatomy; hence anyone who wishes to acquire a thorough knowledge of anatomy must prepare a dead body, and carefully examine all its parts. For it is only by combining both direct ocular observation and the information of the textbooks that thorough knowledge is obtained.” [Cited by Hoernle 1907]

আবার এই যুগেই প্রথম ইহজাগতিক মানব জীবনকে দুঃখময় বলে জানা গেল। শ্রেণি শাসনের কালে অনেকের জীবনই তো সত্যিই দুঃখময়! অতএব সেই দুঃখের হাত থেকে মুক্তির উপায় অনুসন্ধান এবং ধর্ম ভাবনারও জন্ম হল।

প্রসঙ্গত বলা যাক, অথর্ববেদ এবং শতপথ ব্রাহ্মণে মানুষের অস্থিসজ্জা সম্পর্কে অনুরূপ বিবরণ আছে। পরবর্তী হিন্দু ঐতিহ্যে স্মৃতি সাহিত্যে শব ব্যবচ্ছেদ নিষেধের কারণে শুশ্রুতের রচনা যথেষ্ট প্রাচীন বলেই প্রতিভাত হয়।

এই প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যা চর্চার মধ্যে যে একটা সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক ধারা বর্তমান ছিল, তা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর “প্রাচীন ভারতে বস্তুবাদ” গ্রন্থে খুব সুন্দর আলোচনা করে দেখিয়েছেন। তবে গিরীন্দ্রনাথ মুখার্জীর বই থেকে ছবি দিয়ে তিনি যে সমস্ত শল্য হাতিয়ারের উদাহরণ দিয়েছেন, সেগুলো বেশ কষ্টকল্পিত এবং পশ্চাদ-প্রক্ষিপ্ত বলেই আমাদের মনে হয়। কেন না, সমকালীন সময়ে ধাতুবিদ্যা এতটা উচ্চস্তরে পৌঁছেছিল বলে কোনও অনুকূল তথ্য পাওয়া যায় না। এর অনেক পর, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে চিনা পরিব্রাজক ইত-সিং বাগভট নামে একজন চিকিৎসকের কথা বলেছেন, যিনি “অষ্টাঙ্গসংগ্রহ” নামে ভেষজবিদ্যার উপর একখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ততদিনে অবশ্য ভারতে প্রকৃত বিজ্ঞান চর্চা অবক্ষয়ের দিকে হেলে পড়েছে।

বৌদ্ধযুগেই ভারতে গণিতের বিকাশ শুরু হয়। তার আগে অবধি বিবিধ সংখ্যার উল্লেখ দেখা গেলেও স্পষ্টভাবে গণিত চর্চার কোনও সাক্ষ্য মেলে না। প্রাথমিক পর্যায়ে পাটিগণিত ও জ্যামিতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের সূত্রপাত হয় বলে দেখা যায়। কল্পসূত্রের অন্তর্গত শূল্বসূত্রের মধ্যে নানা রকমের গণনা আছে। এই সূত্রের সম্ভাব্য সময়কাল খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় শতক বা তার কাছাকাছি বলে আন্দাজ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শতপথ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতা-তে বেদী নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। বিভিন্ন ধরনের বেদী নির্মাণের জন্য বাহুগুলির আনুপাতিক মাপ নির্ধারণ একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই সূত্রের উদ্ভব তার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকতে পারে। কেন না, এতে পিথাগোরীয় উপপাদ্যের অনুসারী বিভিন্ন ত্রিভুজের বাহুগুলির দৈর্ঘ্যের অখণ্ড পরিমাপের উল্লেখ আছে। তার ভিত্তিতে অনেকে অনুমান করেন, এই সূত্রে পিথাগোরীয় উপপাদ্যের বিকাশ ও প্রয়োগ ঘটেছিল। কিন্তু তা সমর্থন করার মতো যথেষ্ট সাক্ষ্য নেই। কেন না, সাধারণীকৃত কোনও তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত সেখানে অনুপস্থিত।

কিন্তু বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের জন্য এতে এক চমৎকার প্রয়াসের দেখা মেলে। তাতে বলা হয়েছে, বাহুর দৈর্ঘ্যের মাপ নিয়ে তার সঙ্গে তার একের তিন অংশ যোগ করতে হবে, তারপর একের তিনের একের চার অংশ যোগ করতে হবে, সেই যোগফল থেকে বাহুর দৈর্ঘ্যের একের তিনের একের চারের একের চৌত্রিশ অংশ বিয়োগ করলে যে মান আসবে তাই সেই উদ্দিষ্ট কর্ণের দৈর্ঘ্য। আধুনিক অঙ্কের পরিভাষায় বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে কর্ণের দৈর্ঘ্য হবে:

$a\sqrt{2} = a[1 + 1/3 + 1/(3.4) − 1/(3.4.34)] = 1.4142156 . . .,$

অর্থাৎ, $\sqrt{2} = [1 + 1/3 + 1/(3.4) − 1/(3.4.34)] = 1.4142156 . . .$

এই গণনা আধুনিক মানের খুব কাছাকাছি।

পাঠককে লক্ষ করতে বলি, এই হিসাবটা কীভাবে পাওয়া গেল আন্দাজ করুন। জ্যামিতির সাহায্যে √2−এর মান বের করে নিয়ে এই মানটিকে পাটিগণিতীয় পদ্ধতিতেও বের করার চেষ্টা হয়েছে। আজকাল যাকে পৌনঃপুনিক পদ্ধতি (iteration method) বলা হয়, অনেকটা সেইভাবেই ১ এর সঙ্গে কিছু ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ভগ্নাংশ যোগ-বিয়োগ করার দ্বারা উদ্দিষ্ট মানে পৌঁছনোর চেষ্টা করা হয়েছিল। সেকালের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই গাণিতিক বোধ ও প্রয়াস খুবই বিস্ময়কর!

একইভাবেই সেদিনকার মানুষ চেষ্টা করেছিল বর্গের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাসের মান, বৃত্তের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য ইত্যাদির পাটিগণিতিক হিসাব নির্ধারণ করতে। এরকম ধারণা করতে পারাটাই এক বিকাশমান গণিত বোধের সাক্ষ্য বহন করে।

[21/04, 3:53 PM] SUBHENDU BISWAS: জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্র

জ্যোতির্বিজ্ঞান ভারতে স্বাধীনভাবে খুব বেশি দূর বিকশিত হয়নি। বৈদিক সাহিত্যে সূর্য এবং বৃহস্পতি, শুক্র ইত্যাদি দু একটি গ্রহের নাম আছে। কিন্তু তা নিয়ে সময়কাল নির্ধারণের কোনও প্রচেষ্টাই চোখে পড়ে না। খ্রিঃ পুঃ চতুর্থ শতকে বেদাঙ্গজ্যোতিষ রচিত হলেও তাতে আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্পর্কে খুব বেশি পর্যবেক্ষণের নমুনা দেখা যায় না। সূর্যকে কেন্দ্র করে সময় সূচিত করার বিদ্যা প্রাচীন ভারতীয়রা আয়ত্ত করে উঠতে পারেনি। তারা বরং চন্দ্রকে নিয়ে বেশি মাতামাতি করেছে। পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের (আপাত) বার্ষিক আবর্তন পথকে তারা ২৭টি নক্ষত্রের সাহায্যে খুব সুন্দরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিল। এর মধ্যে যে বারোটি নক্ষত্রের কাছে পূর্ণিমার চাঁদের অবস্থান, তাদের নামকরণের ভিত্তিতেই তারা বছরের ১২ মাসের নাম নির্দিষ্ট করেছিল। চিত্রা > চৈত্র; বিশাখা > বৈশাখ; জ্যেষ্ঠা > জৈষ্ঠ; শ্রবণা > শ্রাবণ; পুষা > পৌষ; মঘা > মাঘ; ইত্যাদি। পরবর্তীকালে গ্রিক জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তিতে সূর্যের পরিক্রমাপথকে অবলম্বন করে বারো রাশি এবং চন্দ্রের ভিত্তিতে বারো মাসকে মেলাতে গিয়ে তারা হিমশিম খেয়ে যায়। কেননা, চান্দ্র বৎসর প্রায় ৩৫৪ দিনে আর সৌর বৎসর প্রায় ৩৬৫ দিনে সম্পন্ন হয় বলে উভয়ের মধ্যে গড়ে ১১ দিনের একটা তফাত থেকেই যেত। এর ফলে প্রতি তিন বছরে আবার একটা অতিরিক্ত মাস ধরে একে মেলাতে গিয়ে সেই মাসটিকে মলমাস হিসাবে চিহ্নিত করা হত।

প্রাচীন ঐতিহ্যের জোরে আজও হিন্দু ক্যালেন্ডারে সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান সূচি নির্ণীত হয় চান্দ্র তিথির ভিত্তিতে। চাঁদ মঘা নক্ষত্র পেরোলে শুক্লা পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা হবে। চাঁদমামা অশ্বিন নক্ষত্র পেরিয়ে এগোনোর পরে যে শুক্লা সপ্তমী তাতে দুর্গাপূজার বোধন হয়। ইত্যাদি। এর ফলে বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি করা এখনও একটা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। সৌর রাশিচক্রের সাথে মাসগুলিকে মিলিয়ে তার মধ্যে তিথি ধরে ধরে ধর্মীয়

অনুষ্ঠানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা দেখা দেয়। তখন কিছু মাসের (আষাঢ় শ্রাবণ ইত্যাদি) দিনসংখ্যা ৩২ করে পরিস্থিতি সামলাতে হয়। মেঘনাদ সাহা এক কালে বাংলা ক্যালেন্ডারের সংস্কার বিষয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। [Saha 1952] কিন্তু তাতেও কাজের কাজ কিছু হয়নি।

জ্যোতিষশাস্ত্র কোনও বিজ্ঞান নয় বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানানুশীলনের সঙ্গে তার কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। আধুনিক বিজ্ঞানের সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় জ্যোতিষশাস্ত্র হচ্ছে পরিত্যক্ত জ্ঞান (rejected knowledge) — যা এক সময় যথার্থ জ্ঞান ছিল, কিন্তু কালের নিয়মে জ্ঞানের মূল ধারার বিকাশের সাথে তাল মেলাতে না পেরে যা একই জায়গায় থেমে এবং থমকে আছে। অনেকটা বন্ধ ঘড়ির মতো। কিংবা, পথ বদল করা নদীর ছিন্ন অংশের মতো। বাস্তবে, এ হচ্ছে এক ধরনের জ্ঞানের ফসিল। ফসিল থেকেও অনেক কিছু জানা যায়। সেই জন্যই এই ফসিল নিয়েও আমাদের কিছু কথা বলতে হবে।

ভারতে আজ অবধি যে জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা হয়, তার ভিত্তি হচ্ছে আলেক্সান্দারের আক্রমণের পরে আগত গ্রিক বা আলেক্সান্দ্রীয় জ্যোতিষশাস্ত্র। এই ব্যাপারে আমাদের আলোকপাত করে গেছেন স্বয়ং বরাহমিহির নিজে। তিনি আনুমানিক ৫০৫ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চসিদ্ধান্তিকা শীর্ষক যে গ্রন্থটি রচনা করেন, তাতে পাঁচটি উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্যোতিষবিদ্যার কথা উল্লেখ করেন। যথা:

ক) পৈতামহ সিদ্ধান্ত < বেদাঙ্গজ্যোতিষ;

খ) বাশিষ্ট সিদ্ধান্ত < পৈতামহ;

গ) পৌলিশ সিদ্ধান্ত < পল বা পওলুশ;

ঘ) রোমক সিদ্ধান্ত < রোম;

ঙ) সূর্য্যসিদ্ধান্ত (প্রাপ্ত)।

এই নামগুলি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে অন্তত দুটি সিদ্ধান্ত (গ ও ঘ) বিদেশি উৎস থেকে আগত। এছাড়া, হাতের রেখা দেখে ভাগ্য গণনার যে জ্যোতিষীয় পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত, তারও প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম “হস্ত সামুদ্রিক শাস্ত্র”। হাত দেখার মধ্যে সমুদ্র কোত্থেকে এল? সমুদ্রপার থেকে এই বিদ্যার আগমনের স্পষ্ট স্বীকৃতি এখানে লক্ষণীয়।

উজ্জয়িনীর জ্যোতির্বিদ আর্যভাট, যিনি “আর্যভাটীয়” (৪৯৯) নামক গ্রন্থে তাঁর যাবতীয় পর্যবেক্ষণ লিখে রেখে গিয়েছিলেন, তিনি কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্র নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানেরই চর্চা করেছিলেন। তাঁর অন্যতম আবিষ্কার হচ্ছে পৃথিবীর নিজের অক্ষের চারদিকে ঘুর্ণন,

অর্থাৎ, আহ্নিক গতি এবং তার সাহায্যে দিন ও রাত্রির পর্যাবৃত্তের ব্যাখ্যা। এছাড়া আর্যভাট একটি বৃত্ত এঁকে তাতে বিভিন্ন মাপের জ্যা-এর উপর কেন্দ্র থেকে লম্ব টেনে ০০ থেকে শুরু করে ৯০০ পর্যন্ত ৩০৪৫′ অন্তর বিভিন্ন কোণের জন্য সাইন অনুপাতের একটি সারণি তৈরি করেছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, অষ্টম শতাব্দে আরবি পণ্ডিত আল-খোয়ারিজমি ভারত থেকে এই সারণিটি ইউরোপে নিয়ে যান এবং এর থেকেই পরবর্তীকালে ত্রিকোণমিতির জন্ম হয়।

আর্যভাটের সমকালে, চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দে, ভারতে আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন গণিতে শূন্যের কল্পনা। ইতিমধ্যেই এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাগুলির সাঙ্কেতিক চিহ্ন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কেননা, ইন্দোচিনের ৬০৪ সালে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর ফলকেও এই সংখ্যালিপিগুলির অস্তিত্ব দেখা গেছে। তবে, শূন্যের (আধুনিক) সাঙ্কেতিক চিহ্ন (০) সর্বজনীনভাবে গৃহীত হতে হতে বোধহয় নবম শতাব্দ লেগে যায়। শূন্য ব্যবহারের সঙ্গে ভারতীয় স্থান মান পাতন পদ্ধতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর ফলে যে কোনও বড় আকারের সংখ্যা লেখার উপায় অনেক সহজ হয়ে যায় এবং পাটিগাণিতিক প্রক্রিয়াগুলি নিয়ে কাজ করতেও বিরাট সুবিধা হয়।

শূন্য কীভাবে উদ্ভাবিত হল, তা একটা গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। এখনও কেউ কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেননি। আমার একান্ত নিজস্ব অনুমান, এখানে ক্লার্ক কথিত যুক্তিবাদপৃক্ত বস্তুবাদী চিন্তার এক অনন্য প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। খুব সম্ভবত, শূন্যের ধারণার উৎপত্তির পেছনে রয়েছে রাতের আকাশের সঙ্গে দিনের আকাশের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ। কেননা, রাতের আকাশে দেখা তারাগুলো দিনের আলোয় মিলিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে পরিমাণগতভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলতে হয়েছিল, যে আকাশটা শূন্য বা খালি হয়ে গেল! এই জন্যই হয়তো আকাশের আর এক নাম শূন্য। এর মানে হচ্ছে, প্রচলিত অর্থে আমরা যেরকম বুঝি বা বলে থাকি, শূন্য মানে “কিছুই নয়” (nothing), “কিছুই নেই” (there is nothing) — এরকমটা নয়। শূন্য মানে হল নির্দিষ্ট বস্তুর অনুপস্থিতি (absence of something)। দিনের বেলায় আকাশে সমস্ত তারার অনুপস্থিতিকে দেখেই তাকে শূন্যতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আর পরবর্তীকালে, দিগন্তরেখার সঙ্গে মিলিয়ে শূন্যের লিপি অঙ্কিত হয়েছে গোলাকার রূপে।

ভারতীয় সংখ্যা লিখন ও স্থান মান পাতন পদ্ধতি শূন্য সহ/ছাড়া সিরিয়াতে যায় ৬৬২-এ, বাগদাদে নিয়ে যান আচার্য কণক ৭৭৩-এ। আল-খোয়ারিজমি সিন্ধহিন্দ (সিদ্ধান্ত) গ্রন্থ অনুবাদ করে নিয়ে যান ইউরোপে (৮২৫)। লাতিনে অনুদিত হয় Algoritmi de numerolndorum নামে। তারপর থেকেই ওখানে ধীরে ধীরে বীজগণিতের দ্রুততর বিকাশ শুরু হয়ে যায়। বিশ্বের বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই শূন্যের ধারণা এবং এই স্থান মান পাতন পদ্ধতি প্রাচীন ভারতের এক বিশাল মাপের অবদান হিসাবে সর্বত্রই কমবেশি

স্বীকৃত।

রসায়ন ও ধাতুবিদ্যা

অন্যান্য দেশের মতোই প্রাচীন ভারতেও চিত্রশিল্পের পাশাপাশি পোশাক ও পাকা বাড়িঘরে রং লাগানোর প্রয়োজন থেকেই এক সময় রসায়নের চর্চা শুরু হয়েছিল। এখানে আমরা যে সময়সীমার কথা বলছি, সেই কালে রসায়নবিদ্যার কতটা অগ্রগতি হয়েছিল, জানা যায় না। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রসায়ন চর্চার যে ইতিহাস লিখেছেন, তা মূলত মধ্যযুগের ভারতের। প্রাচীন ভারতের কথা তাতে তিনি খুব বেশি আলোচনা করেননি।

আমরা এখানে একটা বিশেষ অর্জন নিয়ে কথা বলতে চাই, যার মধ্যে প্রাচীন ভারতে ধাতুবিদ্যার চর্চা কতটা এগিয়েছিল সেই বিষয়ে কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। আমরা জানি, দিল্লি, সুলতানগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানে ৫ম শতাব্দে নির্মিত যে লৌহস্তম্ভগুলি রয়েছে, তাতে আজও খুব বেশি মরচে পড়েনি। এই স্তম্ভগুলির উপরে প্রচুর গবেষণা করে দেখা গেছে, আকরিক থেকে লোহার ঢালাইয়ের সময় তার মধ্যে কিছু পরিমাণে যে খাদ মিশে থাকে, যার মধ্যে কিছুটা ফসফরাস ঘটিত যৌগও উপস্থিত থাকত, তারই বিশেষ ভৌত রাসায়নিক ধর্মের কারণে এই লৌহস্তম্ভগুলোতে মরচে পড়েনি। বরং বলা ভালো, সামান্য মরচে পড়ার পর তা নিজেই স্তম্ভের গায়ের লোহার উপাদানের সঙ্গে জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তার অতিরিক্ত জারণের পথ বন্ধ করে দেয়। রসায়ন শাস্ত্রের এই সমস্ত তাত্ত্বিক জ্ঞান না থাকলেও সেই কালে ধাতুকর্মীরা যে অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের সাহায্যে এই অসাধ্য সাধন করেছিল, তার জন্যও তাদের অনেক সাধুবাদ প্রাপ্য। [মুখোপাধ্যায় ২০১৫ক]

এই চর্চা কেন?

অনেকেই মনে করেন, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গ, যুক্তিবাদী শিবির, বামপন্থী দল বা মার্ক্সবাদী মহল জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে প্রাচীন ভারতের কী কী অবদান ছিল, তার কোনও খোঁজখবর রাখেন না। ফলত, তাঁরা প্রায়শই “কী ছিল জানা দরকার” গোছের যুক্তি মন্তব্য বা টিপ্পনী করে থাকেন। তাঁরা আসলে জানেনই না, দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানমনস্ক পণ্ডিতেরাই প্রাচীন ভারতের জ্ঞান সম্পদ উদ্ধার করে চলেছেন সেই ইংরেজ আমল থেকেই। হাতে লেখা পুঁথি উদ্ধার, আসল নকল যাচাই, সম্পাদনা ও মুদ্রণ, সংস্করণ — ইত্যাদি কাজ তাঁরাই অত্যন্ত ধৈর্য ও শ্রদ্ধার সাথে সম্পন্ন করে চলেছেন। নিচে আমি এরকম সামান্য কিছু বইপত্রের উল্লেখ করছি, যাতে বোঝা যায়, এই কাজটি কত কাল আগে থেকে কীভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে।

P. K. Acharya (1935), “University Life in Ancient India”, Science and Culture, December 1935.

A. S. Altekar (1934), Education in Ancient India; Benaras.

E. R. Bevan (1922), “India in Early Greek and latin Literature”, The Cambridge History of India, Vol. I.

W. Brennard (1896), Hindu Astronomy; Straker& Sons, London.

W. E. Clark (1930), The Arbhatiya of Aryabhata; Chicago.

W. E. Clark (1937), “Science”; in G. T. Garrat (ed. 1937), The Legacy of India; Oxford University Press, London.

B. Datta (1932), The Science of Sulba—a Study in Early Himdu Mathematics; Calcutta University.

B. Datta & A. N. Singha (1935), History of Hindu Mathematics, Vols. I-II; Lahore.

Ekendra Nath Ghosh (1932), “Studies in Rig-Vedic Deities — Astronomical and Meteorological”, Journal of the Asiatic Society of Bengal.

A. R. Rudolf Hoernle (1907), Studies in the Medicine of Ancient India, Parts I -II; Oxford University Press.

G. R. Hunter (1934), The Script of Harappa and Mohenjodaro and its connection with other scripts; London.

G. R. Kaye (1915), Indian Mathematics; Calcutta and Simla.

A. B. Keith (1921), Indian Logic and Atomism — an Exposition of the NyayaVaiceshika Systems; Oxford.

M. S. Krishnan (1955), Iron ores of India; Indian Association for the Cultivation of Science, Calcutta.

R. C. Majumdar (1950), “Scientific Achievements of Ancient Hindus:

Chronological and sociological background", Paper Read at Symposium on History of Science in South Asia, New Delhi.

Radha Kumud Mookerji (1951), Ancient Indian Education; MacMillan.

Girindra Nath Mukhopadhyay (1913), The Surgical Instruments of the Hindus, Vols. I-III; Calcutta University.

Girindra Nath Mukhopadhyay (1913), History of Indian Medicine, Vols. I-III; Calcutta.

Panchanan Neogi (1918), Copper in Ancient India; Indian Association for the Cultivation of Science, Calcutta.

Stuart Piggot (1950), Prehistoric India; Penguin.

M. S. Randhawa (1946), "Role of Domesticated Animals in Indian History", Science and Culture, Vol. 12 No. 1.

P. C. Ray (1902-09), History of Hindu Chemistry, Vols. I-II; Calcutta.

Benoy Kumar Sarkar (1918), Hindu Achievements in Exact Sciences; London.

Brajendra Nath Seal (1915), The Positive Sciences of the Ancient Hindus; Longman, Green and Co., London.

K. S. Shukla (1950), "Chronology of Hindu Achievements in Astronomy", Paper Read at Symposium on History of Science in South Asia, New Delhi.

Bhagvat Sinhjee (1896), A Short History of Aryan Medical Science; MacMillan.

D. E. Smith and L. C. Karpinsky (1911), The Hindu Arabic Numerals; Boston and London. H. R. Zimmer (1948), Hindu Medicine; Baltimore.

V. A. Smith (1897), "The Iron Pillar of Delhi", Journal of Royal Asiatic Society, London.

G. Thibaut (1875), “On the Sulvasutras”, Journal of Asiatic Society of Bengal, Vol. 44.

Daniel Uranovic (n. d.), “Indian Prelude to European Mathematics”, Osiris, Vol. I.

তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে। প্রাচীন ভারতে আমরা যে সমস্ত জ্ঞানবিন্দুর সন্ধান পাচ্ছি, তা আজ আর পর্যাপ্ত জ্ঞান নয়, মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার তাকে আত্মস্থ করে এবং ছাড়িয়ে আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এগুলো আজ ঐতিহাসিক অর্থে, কী ছিল অর্থে, জানার বিষয়, কাজে লাগবে বলে জানার বিষয় নয়। প্রাচীন জ্ঞানের সেই স্তর দিয়ে আজ আমাদের কোনও কাজের প্রয়োজনই মিটবে না। কিন্তু আমাদের বর্তমান জ্ঞানসম্ভার কোথা থেকে শুরু হয়েছিল, সেই অর্থে এগুলো খুবই ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে হবে।

উপসংহার

এবারে একটা ভিন্নতর প্রশ্ন। প্রাচীন ভারতের অতীত ইতিহাসের এত সমস্ত গৌরবময় অধ্যায় থাকা সত্ত্বেও এগুলোর উল্লেখ বা চর্চা না করে বিজেপি সঙ্ঘ পরিবারের একদল লোক কেন বারবার নানারকম অসত্য অবাস্তব দাবি পেশ করে থাকে? বৈদিক বিমান, মহাভারতে স্টেমসেল গবেষণা, প্লাস্টিক সার্জারি, ইত্যাদি? শূল্বসূত্র থেকে সোজা পিথাগোরাসের উপপাদ্য? আর্যভাটের কোণানুপাতের সারণি থেকে সিধে ক্যালকুলাস? এ কি নিছক অজ্ঞানতা? জ্ঞানী লোকেদের মতিভ্রম? না, অন্য কিছু?

না। কোনওটাই নয়। আমার স্থির বিশ্বাস, বুঝেশুনেই এরা সত্যকে অস্বীকার করে যাচ্ছে, আর অসত্যকে তুলে আনছে।

কিন্তু কেন?

যাঁরা জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার সাথে আন্তরিকভাবে যুক্ত, তাঁরা জানেন, সেখানে যে কোনও ক্ষেত্রে কাজ করতে গেলেই প্রথমে একজন গবেষককে দেখে নিতে হয়, সেই বিশেষ জায়গায় কী কী কাজ ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। যে অবধি কাজ হয়েছে, তিনি তার পর থেকে শুরু করবেন। আগেকার জানাকে অবলম্বন করেই তিনি সামনের দিকে এগোবেন। নতুন কিছু জানবেন ও জানাবেন। জ্ঞানের জগতে এইভাবেই সংযোজন ও সম্প্রসারণ হতে থাকে। ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে এইখানেই তার একটা মস্ত তফাত। ধর্ম বিশ্বাসে একবার আদি ধর্ম প্রবর্তক গুরুজিরা যা বলে গেলেন, তাই শেষ কথা ও সর্বোচ্চ

জ্ঞান! তা থেকে শুধু নেওয়া যাবে, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ভাব সম্প্রসারণ করা যাবে। টীকা টিপ্পনী যোগ করা যাবে। কিন্তু তাতে আর জ্ঞানের নতুন কোনও বিন্দু সংযোজন করা যাবে না। এই কারণে ধর্মগ্রন্থ নিয়ে কোনও প্রশ্ন করা চলে না। শুধু অন্ধভাবে ভক্তি ভরে মেনে চলতে হয়।

বিজ্ঞানের জগতে চোখ বুজে মেনে চলার প্রশ্নই নেই। যাকে ভিত্তি করে আমি পা বাড়াব, তাতে যদি ভুল থাকে, গলদ থাকে, ফাঁক থাকে, আর সেটা যদি আমি জেনে না নিই, তাহলে আমি যা করব, তাতেও ভুল থেকে যাবে। তাই নিশ্চিত হতে হবে। আবার যে কাজ হয়ে গেছে, তাই নিয়ে পড়ে থাকার মানে হয় না। তাই কদ্দুর কী কাজ হয়ে গেছে তাও জেনে নিতে হয়। এই সব কারণেই বিজ্ঞানের জগতে খুব সচেতনভাবেই অতীতের কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করা নতুন গবেষণা ও অনুসন্ধানের একটা অন্যতম প্রধান শর্ত। আর ঠিক এই কারণেই বিজ্ঞান চর্চার সাথে বিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। তার মধ্য দিয়েই তাদের যুক্তিবোধ ও ইতিহাস চেতনা এক সঙ্গে বিকশিত হতে থাকে।

সুতরাং, যারা চাইবে মানুষের মধ্যে যুক্তিবোধকে হত্যা করতে, ইতিহাস চেতনাকে ধ্বংস করতে, তাদের পক্ষে প্রাচীন ভারতে জ্ঞানবিজ্ঞানের সত্যকারের অগ্রগতির খবর প্রসারিত করা সম্ভব নয় শুধু নয়, অসুবিধাজনকও বটে! তাদের চাই মিথ্যা গর্বের ফানুস। উগ্র জাত্যাভিমান! আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ! বিজ্ঞানের ইতিহাসকে উড়িয়ে দিয়ে ইউরোপ আমেরিকার আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে দু তিন হাজার বছর আগে ভারতের মাটিতে ঘটিয়ে দেওয়া। স্বভাবতই যাঁরা প্রকৃত বিজ্ঞানের চর্চা করেন, বিজ্ঞানের ইতিহাসের খবর রাখেন, তাঁদের পক্ষে সেই সব গুল্প বিশ্বাস করা, মেনে নেওয়া, প্রচার করা সম্ভব নয়। তাঁরা এর বিরোধিতা এবং সমালোচনা করবেনই। আর ঠিক তখনই একটা গণ-আওয়াজ তুলে দেওয়া যাবে — এই দেখ, বলেছিলাম না, ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদী মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট লোকজন দেশের ঐতিহ্য মানে না, মানতে চায় না, দেশের অতীত নিয়ে তাদের কোনও গর্ববোধ নেই, ইত্যাদি!

এই দিক থেকে একটা বিপদ ঘনিয়ে তোলা হচ্ছে অনেক দিন ধরে। বিশেষ করে বিভিন্ন দফায় বিজেপি দেশের শাসন ক্ষমতায় আসীন হতে শুরু করার পর থেকে। বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিকে দীর্ঘদিন ধরেই এদেশে অবহেলা করা হয়েছে। কংগ্রেসের আমল থেকেই। তাদের শিক্ষানীতির মাধ্যমেও। জহরলাল নেহরুর বৈজ্ঞানিক মানস (scientific temper) সৃষ্টির শ্লোগানকে খানিকটা তামাশা করেই, তাঁরই দলের নেতামন্ত্রীরা অবৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রচার প্রসার করে গেছেন নিশ্চিন্ত এক আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে। তার ফলে সারা দেশের আমজনতার তো বটেই, এমনকি শিক্ষিতদের এক বৃহত্তর অংশের মধ্যেও পৌরাণিক গল্পগুজবকে সত্য ঘটনা বলে বিশ্বাস করা, “ব্যাদে সব আছে” বলে মনে করা, প্রাচীন

মুনিঋষিরা ত্রিকালে জ্ঞাতব্য সমস্ত কিছুই জানতেন বলে ভাবতে পারা, ইত্যাদি – স্বাভাবিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছিল। বিজেপি এবং সঙ্ঘ পরিবার এটা জানত। তারা এই পরিস্থিতির ভালোরকম ফায়দা তুলতে চেয়েছে গত কয়েক বছরে।

তারা জানে, সাধারণ মানুষের মধ্যে যদি প্রকৃত ইতিহাসের চর্চা হয়, প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের ঘটনাভিত্তিক আলোচনা হয়, তখন তারা অনেক ভুল ভ্রান্তি অন্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তারা অনেক জিনিস যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ তুলনা করতে শিখবে। তাদের তখন আর যা হোক কিছু বুঝিয়ে দেওয়া যাবে না।

অথচ বোঝাতে তো হচ্ছে! এক বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষ এগুলোর দ্বারা প্রভাবিতও হচ্ছে। গো-ভজনা, মুসলমান বিদ্বেষ, কাশ্মীর নিয়ে গা-গরম দেশপ্রেম, পাকিস্তান বিরোধী জিগির, ইত্যাদি তো আছেই। তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, সেই মনমোহনের আমল থেকেই ভারতীয় পুঁজিবাদ খুব দ্রুত অর্থনীতি রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। স্বাধীনতা-উত্তর কালে যতটুকু সীমিত গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার প্রভাবে যে সামান্য একটা জনমুখী অর্থব্যবস্থার ঠাটবাট তৈরি করা হয়েছিল, ১৯৯১-উত্তর "উদার"-নীতির আমলে সেই সমস্ত ভেঙে দিয়ে ভারতীয় পুঁজিবাদ তার দাঁত-নখ বের করে ফেলেছে। আর কংগ্রেসি রাজনীতিতে যে ঢিলেঢালা ভাব ছিল, বিজেপি তা কাটিয়ে উঠে দ্রুত সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শাসক দলীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে ফেলতে চাইছে। প্ল্যানিং কমিশন ভেঙে দেওয়া, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাথায় দালাল বসানো, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সঙ্ঘের লোকজনকে নিযুক্ত করা, বিচারক নিয়োগের ক্ষমতা সরকারের হাতে তুলে নেওয়ার প্রচেষ্টা, পার্লামেন্টের বাইরে সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া – এসব এখন এক সাধারণ ঘটনায় পর্যবসিত।

গোপাল গান্ধী ২০১৪ সালে (তখনও মনো আমল) সিবিআইয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসের ভাষণে অভিযোগ করেছিলেন, একটা কর্পোরেট পরিবার (রিলায়েন্স গ্রুপ) দেশের সমস্ত রাষ্ট্রীয় সম্পদের সিংহভাগের মালিক ও নিয়ন্ত্রক হয়ে বসেছে। দিল্লির সরকার তাদের কথায় ওঠবোস করে চলেছে। সেই অভিযোগ আরও সাংঘাতিকভাবে এখন মূর্তরূপ ধারণ করেছে। তবে হ্যাঁ, একটা নয়, একাধিক কর্পোরেট গ্রুপ। আম্বানির পাশাপাশি আদানি, বেদান্ত, এশার, মাল্য, রামদেব, ইত্যাদিরাও এই সার্বিক লুটের খেলায় এখন অংশীদার। এই লুটের অংশ হিসাবেই সরকারি ব্যাঙ্ক থেকে লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে তারা ফেরত দিচ্ছে না, সেই অবস্থাতেই আবার ঋণ নিচ্ছে এবং মোদীর বদান্যতায় পেয়েও যাচ্ছে। ছত্তিসগড়ে অ্যালুমিনা সহ বিবিধ খনিজ আকরিক উৎসের উপর বিনি পয়সায় দখল নেওয়ার জন্য আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে পাহাড় জঙ্গলের যথেচ্ছভাবে ইজারা বণ্টন চলছে। কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্যে সরকারি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে দেশের বিভিন্ন

জায়গায় হাজার হাজার একর জমি পতঞ্জলিকে বিনা পয়সায় দান করা হচ্ছে তার ব্যবসাকে বাড়িয়ে তোলার জন্য। এইভাবেই বড় নোট বাতিলের হিংস্র আগ্রাসনে দেড় শতাধিক নাগরিককে হত্যা করে এক ধাক্কায় কয়েক লক্ষ কোটি টাকা মানুষের পকেট থেকে জবরদস্তি কেটে এনে ব্যাঙ্কের শূন্যস্থান পূরণের ব্যবস্থা হয়েছে। বিজয় মাল্যর পর নীরব মোদী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে পাহাড়-প্রমাণ অঙ্কের টাকা লোপাট করে বিদেশে নিশ্চিন্তে পালিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে, বর্তমান বিজেপি সরকার কাদের স্বার্থে এবং কাদের জন্য শাসন চালাচ্ছে! সুপ্রিম কোর্টের বাধা সত্ত্বেও জোর করে সর্বত্র আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করে জনসাধারণের ব্যক্তিগত তথ্য ভারত সরকার হয়ে আমেরিকান সরকারের মহাফেজখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি একটা বিল আনা হয়েছে, যার লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক দেউলিয়া অবস্থায় পতিত হলে সাধারণ মানুষের গচ্ছিত অর্থ থেকে টাকা কেটে তাকে রক্ষা করা হবে। এ এক বিপ্র-অভিস্রবণ প্রক্রিয়া (reverse osmosis), যেখানে বিপুল পুঁজির মালিক আম্বানি-আদানি-বেদান্তদের অনাদায়ী ঋণের বোঝার ভার কার্যত বইতে হবে নিঃস্বপ্রায় আমজনতাকে।

কিন্তু এই সব চূড়ান্ত জনস্বার্থ হত্যাকারী পদক্ষেপগুলোকে লোকচক্ষুর থেকে প্রথমে আড়াল করে রাখতে হবে এবং তারপর সাধারণ মানুষকে অন্য দিকে মাতিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা খানিকটা বোঝার পরও এর দিকে যথেষ্ট মনঃসংযোগ না করে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও মনন-বিভাজন, গোরক্ষার হুজুগ, লাভ জেহাদ রোখা, পাকিস্তান বিরোধী জিগির, ইত্যাদির নামে যত্রতত্র হামলা চালিয়ে সঙ্ঘ পরিবার তাদের নানারকম সংগঠনের মাধ্যমে সারা দেশে এক উগ্র ধর্মান্ধ হিংস্রতার জন্ম দিয়ে চলেছে। দেশীয় ঐতিহ্যের নাম করে প্রাচীন কালজীর্ণ জাতপাতের ঘৃণা বিদ্বেষকে নতুন করে চাগিয়ে তুলে বিভিন্ন প্রান্তে দলিতদের উপর বর্বর আক্রমণ ও অবমাননার ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। বাংলাদেশের মতোই ভারতেও একের পর এক নরেন্দ্র দাভোলকর, গোবিন্দ পানসারে, এম কালবুর্গি, গৌরী লঙ্কেশ প্রমুখকে হত্যা করে এরা যুক্তিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির প্রতিবাদী মুখগুলোকে ভয় দেখিয়ে বন্ধ করে দিতে চেষ্টা করছে।

যাঁরা এই সব দুর্যোগ দেখে একে রুখবার কথা ভাবছেন, তাঁদের উপায়ের কথাও ভাবতে হবে। অযুক্তি কুযুক্তি অন্ধতা অজ্ঞতা এবং হিংসার জবাব দিতে হবে যুক্তি তথ্য সত্য জ্ঞানের প্রবলতর চর্চার মাধ্যমেই। শেষ পর্যন্ত তার শক্তি অনেক বেশি। ইতিহাসে এই শক্তিই শেষ অবধি টিকে যায় এবং বিজয় লাভ করে। ব্রুনোর হত্যাকারী, গ্যালিলেওর নির্যাতনকারীদের নাম মানুষ বহু কাল আগেই ভুলে গেছে; ব্রুনো গ্যালিলেওরা ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন! বাইবেলের বিদ্যা এখন শিশুদের হাস্যরসের অফুরান জোগানদার। আর তাঁদের নিরলস অকুণ্ঠ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার মানব জাতির যৌথ

সম্পদ হয়ে রয়ে উঠেছে। আমাদেরও ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রাম মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও জীবন-জীবিকার অধিকার রক্ষার পাশাপাশি ভারতের প্রাচীন কালের প্রকৃত অর্জনগুলিকে এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যে আজগুবি বৈজ্ঞানিক দাবিপত্রের কোনও প্রয়োজনই সেখানে থাকবে না! তারপরেও যারা ঋগ্‌বেদে বিমান চালাবে, পুরাণে জেনেটিক্স আপলোড করবে, গান্ধারীর ক্লোনিং করে শতপুত্র বানাবে, সাধারণ মানুষ শুধু তাদের ভুলটা ধরে ফেলবে না, এই সব বিভ্রান্তি প্রচারের নিগূঢ় উদ্দেশ্যও ধরে ফেলবে